Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya

Dept.of History

Teacher's name - Prof.Prabir Mukhopadhyay

Study materials for B.A 6th sem students

Scanned with CamScanner

"সিদ্ধিদাতা গণেশ" -এর পুজো করা হয়।

৫০.৬ চীনের ধর্মচেতনা

চীনা সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি ছিল ধর্ম। ধর্মাচরণের ভিত্তি আবর ছিল কতকগুলো সামাজিক সম্বন্ধ : 'সান-কাং' বা তিন-বন্ধন, 'লু-চি' বা ছয় বিভাগ, 'উ-লুন', বা পাঁচ কুটুম্বিতা এবং 'চিউ-ৎসু' বা নয় পুরুষ। 'সান কাং'-এর মধ্যে আছে—(১) রাজা-প্রজা, (২) পিতা-মাতা-সন্তান এবং (৩) স্বামী-স্ত্রী। 'লু-চি'র মধ্যে আছে—(১) ভাইবোন, (২) পিতা-পিতৃব্য, (৩) বংশানুক্রম, (৪) মাতা-মাতুল, (৫) শিক্ষক-ছাত্র এবং (৬) বন্ধু-বান্ধবী। 'উ-লুন' ও 'চিও-ৎসু' হল বর্তমান ও উর্ধ্বতন পুরুষদের নিয়ে।

এইসব সম্বন্ধে আবন্ধ চীনারা অনেক নীতিপালনের মধ্য দিয়ে ধর্মাচরণের সূচনা করেছিল। যুগযুগ ধরে চীনা মনীষীরা এইসব নীতি রচনা করেছিলেন। নীতিগুলোর প্রথমেই উল্লেখ্য 'উং চাং' বা পাঁচটি নীতি। এগুলো হল : জেন—উপচিকীর্ষা, য়ি—ন্যায়পরায়ণতা, লি—শিষ্টাচার, চিহ—জ্ঞান এবং শিন—সত্যবাদিতা। দ্বিতীয়ত উল্লেখযোগ্য 'স্সু-শিং' বা চার-কর্তব্য। এগুলো হল শিয়াও—বাৎসল্য, তি—সৌভ্রাতৃত্ব, চুং—বিশ্বস্ততা, শিন—সত্যনিষ্ঠা। এছাড়াও চীনে বহুবিধ নীতি চালু ছিল। পরবর্তীকালে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন এই সূত্রগুলোকে একত্র করে নতুন নীতিধারার প্রবর্তন করেন, তাকে বলা হয়, 'পা-তেহ্' বা আটপ্রকার ধর্মনিষ্ঠা।

মধ্যযুগের চীনে যে প্রতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনার বিকাশ ঘটে, তার তিনটি ধারা ছিল। এই তিন ধারার ভিত্তি রচনা করেছিল ফুসফুসীয় নীতিমালা, তাও-শিক্ষা ও বৌদ্ধ ধর্ম।

কনফুসীয় নীতিমালার প্রবক্তা দার্শনিক কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রিস্টপূর্ব) শান্টুং প্রদেশের লু নামক সামন্তরাজ্যের এক অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন। বাবা শিউ লিয়াং ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং মা চেন সাই ছিলেন অভিজাত 'ইয়েন' বংশের মেয়ে। কনফুসিয়াস নামটি ল্যাটিন। এর চীনা নাম 'ফুয়াং ফু জি', অর্থাৎ মহাপ্রভু কুং।

কনফুসিয়াস প্রচলিত অর্থে ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, ছিলেন নীতিশিক্ষক। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন, কনফুসিয়াসকে প্রাচীন গ্রীসেও লাইকারগাস বা সোলোনের সম-আসনে রাখাই ভালো (Confucius himself belongs rather to the type of Lycurgus and Solon than to that of the great founders of religious–Bertrand Russel : The Problem of China). কনফুসিয়াস নিজে কোনো মৌলিক তত্ত্বের দাবি করেননি। তিনি তাঁর নীতিধর্মে (লি) প্রাচীন জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর কথা বলেছিলেন। তিনি পাঁচটি নৈতিক বিষয়ের কথা বলেন—দান, শুচিতা, জ্ঞান, ন্যায়বোধ ও বিশ্বাস।

Scanned with CamScanner

এছাড়াও তিনি ছটি গুণের অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো হল, সু (পরার্থপরতা), জেন (মানবিকতা), ই (সত্যনিষ্ঠা), লি (শালীনতা), চি (প্রজ্ঞা) ও সিন (আন্তরিকতা)। রাজা-প্রজা, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ এবং বন্ধু-বান্ধবী এই পঞ্চ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা কনফুসীয় নীতিমালার অন্যতম অংশ। কনফুসিয়াস শাসকের কল্যাণকর শাসন ও ন্যায়সংগত আচরণের ওপর জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন, রাজা তার কর্তব্যে ব্যর্থ হলে প্রজার বিদ্রোহ বৈধ। তাঁর মতে, প্রজারাই রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তি।

কনফুসিয়াসের শিক্ষায়তনকে বলা হত 'শতদর্শন শিক্ষায়তন'। তাঁর শিক্ষার প্রধান তিনটি বিষয় ছিল ইতিহাস, সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্র। প্রাচীন ঐতিহ্যক মর্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কনফুসিয়াস ধ্রুপদী বিদ্যা উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। ইতিহাস মন্থন করে তিনি গ্রন্থপঞ্চক সংকলন করেছিলেন। এগুলো হল :

১। লি চি বা অনুষ্ঠানপদ্ধি। এতে আছে ধর্মব্যাখ্যা ও সদাচারের নিয়মাবলি ;

২। ই কিং বা পরিবর্তন-তত্ত্ব। প্রধানত জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং জ্যামিতিক-বিদ্যা এতে আছে ;

৩। সি কিং বা কাব্যগ্রন্থ। এটা মানুষের জীবন ও নীতি বিষয়ে অনেক প্রাচীন কবিতার সংকলন ;

৪। চুন-কিউ বা বসন্ত ও শরতের বিবরণ। এটা কনফুসিয়াসের মাতৃভূমি লু-র ইতিহাস ;

৫। সু-কিং বা ইতিহাসগ্রন্থ। এটা আদি চীনের ইতিবৃত্ত।

এই গ্রন্থপঞ্চক ছাড়াও চারটি 'সু' বা গ্রন্থ, মোট নটি গ্রন্থের সমষ্টি কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। 'প্রাজ্ঞবচন' বা Analect তার একটি, কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর উপদেশাবলি এই গ্রন্থে সংকলিত করেন। অন্য তিনটি গ্রন্থ হল : (১) টা-সুয়ে বা মহাবিদ্যা, (২) চু ইয়াং বা মধ্যপন্থা এবং (৩) মেনাসিয়াসের গ্রন্থ। সক্রেটিসের ভাষ্যকার যেমন প্লেটো, মেনসিয়াসও তেমনি ছিলেন কনফুসিয়াসের ভাষ্যকার।

কনফুসীয় নীতিবিদ্যার বিপরীতে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁরই সমসাময়িক কিন্তু অগ্রজ লাওৎজু (Lao-tzu) বা লাগুৎসির (Lao-tse) তাও-শিক্ষা। তাও কথাটির অর্থ পথ। কিন্তু কনফুসিয়াস সাধারণ মানুষকে দৈনন্দিন সমাজজীবনের সুস্থাতার পথ দেখিয়েছিলেন, আর লাওৎজু দেখিয়েছিলেন বুদ্ধিচর্চার পথ, ব্রহ্মবাদী নিষ্কাম কর্মযোগের পথ, যে পথ ধরলে মানুষ ধৈর্য, বিনয়, প্রজ্ঞা, প্রেম, করুণা, অহিংসা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অধিকারী হতে পারে। রাজার দেশ শাসনের ক্ষেত্রেও লাওৎজু হস্তক্ষেপ বিনা দেশ শাসন বা নিঃস্বার্থ প্রজাপালনের কথা বলেছিলেন, যা আসলে ছিল অবাস্তব। অবাস্তব এবং সহজবুদ্ধিগ্রাহ্য নয় বলেই তাও-শিক্ষা বা লাওৎজু-র শিষ্য চুয়াংৎসু (Chuang-tzu)-র ব্যাখ্যা, এবং তাওশিক্ষার দুটো বই তাও এবং তি, একত্রে তাও-তে চিং (Tao-Te-Ching) সাধারণের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

এই দুই ধর্মপথ ছাড়াও খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে তৃতীয় ধর্মপথের সন্ধান চীনারা পেয়েছিল—তা হল বৌদ্ধধর্ম। কথিত আছে, হানবংশীয় সম্রাট মিং তি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ভারত থেকে দুজন বৌদ্ধ শ্রমণকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। এঁরা হলেন কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মারণ্য। মহাযান বৌদ্ধধর্মই চীনে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়, যদিও হীনযান শাখারও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শ্রেণীনির্বিশেষে চীনা সমাজ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কারণ চীনা নৈতিকতার সঙ্গে বৌদ্ধ জীবনদর্শনের সাদৃশ্য ছিল।

Scanned with CamScanner

৪৯.৩ চীনে ঐতিহ্যবাদের প্রভাব

চীন একটি গোঁড়া ঐতিহ্যবাদী দেশ (traditionalist)। তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ ধরন ছিল। মার্কোপোলোর মতো মধ্যযুগীয় পর্যটক, আর ভোলতেয়ার—দিদেরো-র মতো অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক—সকলেই একথা স্বীকার করেছেন। নিজেদের কৃষ্টি বিষয়ে চীনারা খুবই অভিমানী ছিলেন। স্বদেশকে তারা বলতেন ঝংগুয়ো বা আসল দেশ ; নিজেদের সভ্যতাকে বলতেন ঝংঘুরা বা সব সভ্যতার মূল। চীনাদের দাবি, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকেই তারা ছ'প্রকার কলাবিদ্যায় পারদর্শী। এগুলো হল : 'লি' বা শিষ্টাচার, 'য়ো' বা সংগীত, 'শে' বা ধুনর্বিদ্যা, 'য়ু' বা সারথ্য, 'শু' বা রচনা এবং 'সু' বা অঙ্কশাস্ত্র। চীনের স্বাভাবিক জীবনদর্শন সৃষ্টিবাদ (Creationism) বা অদ্বৈতবাদ (Monism) কোনোটিকেই গ্রহণ করেনি। কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তাদের জগৎ তৈরি হয়েছে, একথা যেমন তারা বিশ্বাস করেনি, তেমনি অতীন্দ্রিয় পরমপিতা আর তাদের জাগতিক জীবন অভিন্ন সূত্রে বাঁধা—একথাও তারা বলতে চায়নি। তাদের ধারণায়, জীবপ্রক্রিয়ার দুটো বিপরীতমুখী শক্তি কাজ করে। একটি হল 'ইন' এবং অন্যটি হল 'ইয়াং'—যেমন সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়, সাকার-নিরাকার, গুণ-নির্গুণ, চন্দ্র-সূর্য, রাত্রি-দিন, নারী-পুরুষ ইত্যাদি। এই দুই-এর টানাপোড়েনেই সভ্যতা তৈরি হতে থাকে। অনেকে বলেন, টানাপোড়েন বা দ্বন্দ্বের ধারণা চীন সংস্কৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি। তাই মাও-সে-তুং সহজেই তাদের দ্বন্দ্বতত্ত্ব বোঝাতে পেরেছিলেন।

এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে চীনা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তাকে চীনারা মনে করত পবিত্রতম বা সভ্যতম। তাদের মতে, চীনা সভ্যতার প্রধান গুণ চারটি।

(ক) চীনা সভ্যতা মৌলিক এবং সৃজনক্ষম। চীনা সভ্যতা কাউকে অনুকরণ করেনি, চীনারা তাই কার কাছে ঋণী নয়।

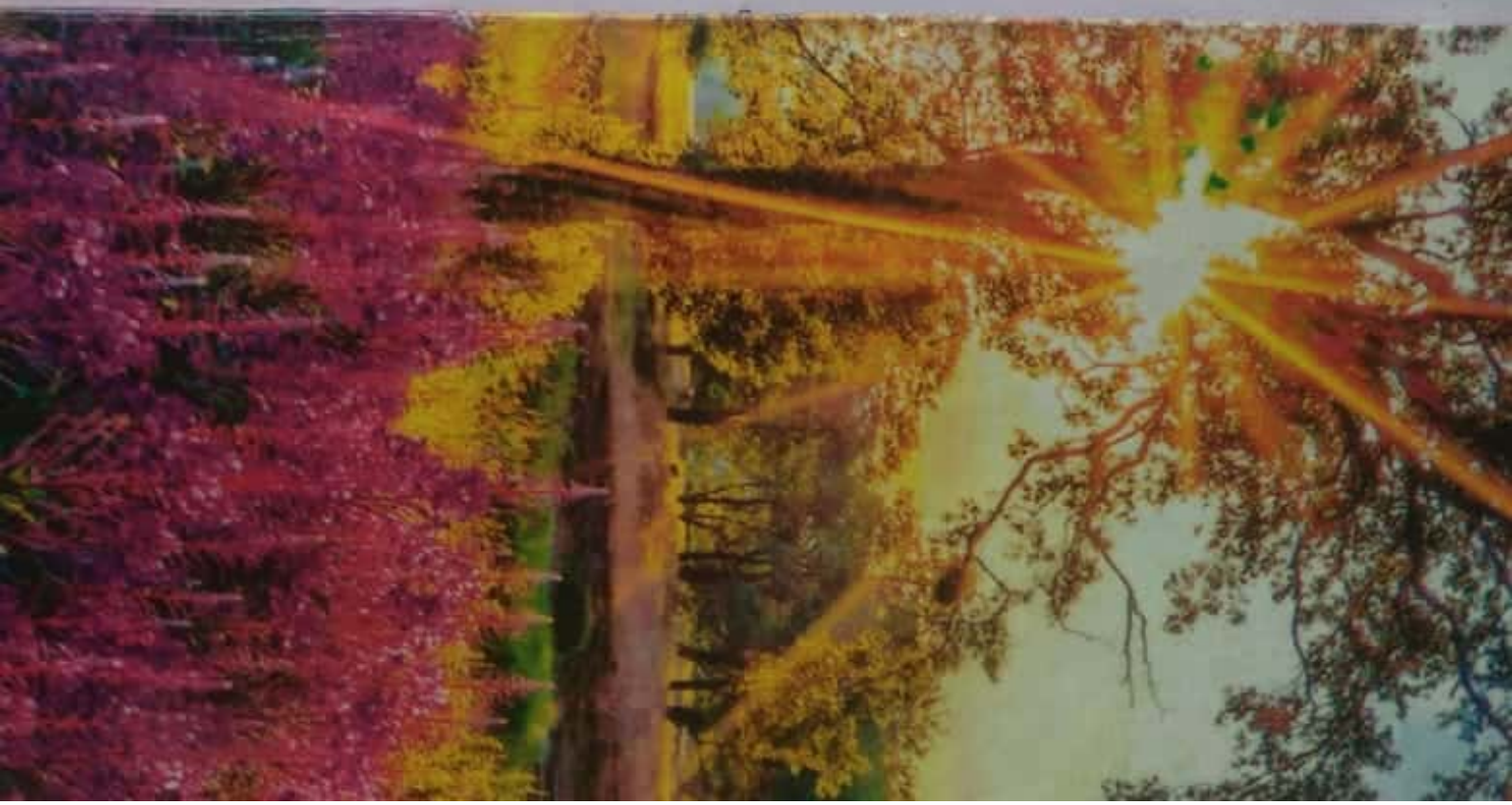

Scanned with CamScanner

(খ) স্থায়িত্ব এই সভ্যতার বড় গুণ। মিশর, ব্যাবিলন ও সিন্ধুর সভ্যতা লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু চীনের সভ্যতা শুধুই টিকে যায়নি, প্রসারলাভও করেছে।

(গ) এই সভ্যতা বহুব্যাপ্ত। আয়তনে চীন বিরাট। এই বিশাল দেশে এক ভাষা, এক বর্ণমালা।

(ঘ) চীনা সভ্যতার চতুর্থ গুণটি হল এর মানবিকতা ও বিশ্বপ্রেমিকতা।

ঐতিহ্যবাদের প্রভাবে চীনারা এই গুণগুলোকে বাইরের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সচেষ্ট ছিল। তাই অষ্টাদশ শতকের পশ্চিমী সভ্যতাকে (Herodianism) তারা বর্বর মনে করেছিল এবং জাপানি প্রয়োগবাদকে দূরে রেখে পশ্চিমের দিকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে ছিল। সমাজ রক্ষা করতে হলে প্রাচীন শিক্ষার ভিত্তি অটুট রাখা দরকার, কনফুসীয় এই শিক্ষা চীনারা কখনো ভোলেনি। পশ্চিমী পণ্যসভ্যতার স্পর্শে সেই ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে, এই ভয়ে তারা দীর্ঘদিন পশ্চিমকে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিয়েন্-লুং রাজত্বের সময়ে ব্রিটিশি প্রতিনিধি লর্ড ম্যাকার্টনি ব্রিটেন-রাজের শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে চীনে আসেন। কিন্তু জবাবে চিয়েন্-লুং ব্রিটেন-রাজকে একটা চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি লেখেন—

"আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য তদারক করবার জন্য লোক পাঠাবার যে প্রস্তাব আপনি করেছেন তা অনুমোদন করা সম্ভব নয়, কেননা সেটা আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের আইনবিরুদ্ধ। আমার প্রধান কাজ প্রজাপালন। দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান জিনিস আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়।

বস্তুত, আমার এই স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে কোনো জিনিসের অভাব নেই। সবই প্রচুর পরিমাণে এখানে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বহির্জগতের বর্বরদের তৈরি কোন জিনিস আমদানি করবার আমার দরকার নেই।"

Scanned with CamScanner

৫০.২ প্রাচীন চীনের সামন্ততন্ত্র

দীর্ঘকাল ধরে চীনের রাজনীতি-অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি। মধ্যযুগে কৃষি যেমন সংগঠিত উৎপাদনের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তেমনি একে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছিল সামন্ততন্ত্র। চীনের সামন্ততন্ত্রকে দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব একাদশ অব্দে শুরু হয় আদি-ব্যবস্থার সামন্ততন্ত্রের (early feudalism) পর্যায়। তার প্রায় তিন-চারশো বছর পর দেখা যায় পরিণত সামন্ততন্ত্র (mature deudalism)।

৫০.২.১ আদি সামন্ত্রতন্ত্র

ইয়াং-শাও, মতান্তরে লুং-শান সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা শাং বংশের শাসনকালে চীনের আদি-সামন্ততন্ত্র দেখা যায় বলে অনেকে মনে করেন। হোনান, পশ্চিম শান্টুং, দক্ষিণ হোপেই, মধ্য ও দক্ষিণ শান্‌সি, পূর্ব শেন্‌সি এবং কিয়াংসু ও আনহুই-এর অংশবিশেষ নিয়ে আনুমানিক একাদশ-দশম খ্রিস্টপূর্বাব্দে গড়ে উঠেছিল শাং রাষ্ট্র। সেচভিত্তিক কৃষি আর অশ্ব-রথে চড়ে তীর-ধনুক দিয়ে লড়াই—এই ছিল শাং রাষ্ট্রের মূল শক্তি।

শাং রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ও রাষ্ট্রের সব জমির মালিক ছিলেন রাজা, যিনি মৃত্যুর পর 'তি' বা পরম-দেবতার মর্যাদা পেতেন। রাজার উত্তরাধিকারের নিয়ম ছিল মজার। একজন রাজা মারা যাওয়ার পর তার পরবর্তী ভাই রাজা হতেন। সব ভাইয়ের মৃত্যু হলে প্রথমে বড় ভাইয়ের ছেলেরা, বড় থেকে ছোট, তারপর তার পরে ভাইয়ের ছেলেরা পরপর রাজা হতেন। রাজার 'চেন' কর্মচারীরা অভিজাতদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতেন। অভিজাত জমিদাররা রাজাকে 'কর' পাঠাতেন। অন্তত ৩০টি রাজ্য থেকে আসত নজরানা।

রাজার পরেই সামাজিক স্থান ছিল অভিজাতদের। তারাই হতেন জমির নিয়ন্ত্রক। তারা ঘোড়ার গাড়ি চড়তেন। সাধারণ মানুষের গাড়ি চড়ার অধিকার ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ কৃষিকাজে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তারা মূলত ছিলেন অভিজাতদের অধীনে ভূমিদাস। গ্রামের কারিগর ও শিল্পীরাও বংশপরম্পরায় তাদের অধীনে থাকতেন। শাং রাজা যখন অন্য কোনো রাজ্য জয় করতেন, তখন সেই রাজ্যের কৃষক-কারিগর-শিল্পীরাও এমনিভাবে দাস-এ পরিণত হতেন, আর সেই রাজ্যের অভিজাতরা শাং রাষ্ট্রের অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতেন। পরবর্তীকালে চৌ বংশ যখন শাং রাজ্য জয় করে নেয়, তখন শাং রাজ্যের বেলায় একই ঘটনা ঘটে।

৫০.৩ সামন্ততন্ত্রের পরবর্তী পর্যায়

পশ্চিমী ধাঁচে না হলেও চৌ বংশের আমলে যে চীনে পরিণত সামন্ততন্ত্রের ছবি দেখা গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। চৌ-রা পশ্চিমদিকের অঞ্চল থেকে পূর্বদিকে শাং রাষ্ট্রের দিকে এগিয়েছিলেন। একসময়ে শাংদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। তারপর দশম খ্রিস্টপূর্বাব্দের কোনো এক সময়

Scanned with CamScanner

ব্রোঞ্জ ধাতুর উন্নততর অস্ত্রের অধিকারী চৌ-রা শাংদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে মধ্য জোনানা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চৌ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। শাং-সংস্কৃতির সঙ্গে তারা জুড়ে দেন পশ্চিম থেকে নিয়ে আসা তুর্কি আর দক্ষিণ থেকে নিয়ে আসা তিব্বতি সংস্কৃতি।

ঘটা করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'সুং ফা' বা মহামহিম চৌ-সম্রাট অভিজাতদের ভূম্যধিকার প্রদান করতেন, সেই সঙ্গে দেওয়া হত একটি সনদ। তাতে লেখা থাকত, নতুন সামন্তপ্রভুর অর্থনৈতিক ও সামরিক দায়দায়িত্বের কথা। প্রথমে চৌ-বংশের আত্মীয়দের মধ্যেই এই ভূম্যধিকার বিলি করা হত, তারপর সহযোগী গোষ্ঠীগুলোর মোড়লদের। বড় ভূস্বামীরা আবার স্বগোত্রের অন্যদের মধ্যে পত্তনি দিতেন। এইভাবে তৈরি হত উপ-সামন্ত-সত্ত্ব। কয়েক শতকের মধ্যে ভূম্যধিকার হয়ে যায় পারিবারিক এবং হাং বংশের রাজত্বের সময় (আনুমানিক ২০৬-২২০ খ্রিস্টাব্দ) অভিজাত চীনারা কৌমের বদলে পরিবারের নামেই পরিচিত হতে থাকে। এই অভিজাতদের মধ্য থেকেই চীনের সামন্ত প্রশাসকশ্রেণী বা ম্যান্ডারিন তৈরি হয়েছিল। প্রধানত ছ'রকমের ম্যান্ডারিন তখন দেখা যেত। রাজকীয় দপ্তরের জন্য 'Mandarin of Heaven', জনকল্যাণের জন্য 'Mandarin of Earth', ধর্মানুষ্ঠানের জন্য 'Mandarin of Spring' প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধের জন্য 'Mandarin of Summer' বিচারের জন্য 'Mandarin of Autumn' এবং পূর্ত দপ্তরের জন্য 'Mandarin of Winter'।

৫০.২.১ সামন্ত্রতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চীনে সামন্ততন্ত্র সংহত হয়ে উঠেছিল। এই সামন্ত্রতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। চীনা সামন্ততন্ত্র ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও কেন্দ্রীভূত। সাধারণ ব্যবহার্য হস্তশিল্পভিত্তিক সব বস্তু কৃষকরা ও তাদের সহযোগী কারিগররা গ্রামেই তৈরি করে নিত বটে, কিন্তু খনিজ শিল্প ও উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো ভূস্বামী রাষ্ট্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে চলে যেত। নিয়ন্ত্রিত শিল্পের কারিগররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল রাষ্ট্রীয় দাস। রাজধানী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সংগঠিত রাজকীয় আমলাতন্ত্রর সম্রাটের নেতৃত্বে ভূস্বামীদের প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটাত। কিন্তু এই আমলাতন্ত্র স্বতন্ত্র শাসকগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে ওঠেনি। সুতরাং চীনা সামন্ততন্ত্র ছিল কেন্দ্রীভূত এক অতি উন্নত সামন্তব্যবস্থা।

চীনের সামন্ত্রতন্ত্র ছিল দীর্ঘস্থায়ী। সমাজে পুঁজির বিকাশের শর্ত উপস্থিত ছিল না তা নয়, কিন্তু তবুও সামন্ত ব্যবস্থা টিকে গিয়েছিল। মিং রাজবংশের আমলে (১৩৬৮-১৬৪৪) সামন্ত খাজনা ও দৈহিক শ্রমকে একত্রিত করে রৌপ্যমুদ্রায় দেয় অর্থ খাজনায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। চিং রাজবংশের আমলে কুয়াংসি প্রদেশের খনিশিল্পে, কুয়াংতোং প্রদেশের বস্ত্রশিল্পে বা চিয়াংসি প্রদেশের চীনামাটির শিল্পে শ্রমবিভাগের বিকাশ ঘটেছিল। শান্‌সি প্রদেশের খাজাঞ্চিখানায় প্রাচীন ব্যাঙ্কিং ও ঋণব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও চীনা সামন্তব্যবস্থার দেওয়াল ভাঙেনি। এর কারণ সংগঠিত চীনা সামন্তবাদে ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণী ভূস্বামীদের অধীনস্থ হয়ে যেত ও এই তিনের নিবিড় সমন্বয় সামন্ততন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলত। যেহেতু ব্যবসায়ীদের ও মহাজনদের রাজনৈতিক আভিজাত্য স্বীকার করা হত না, তাই তারা পুঁজির মালিক হওয়ার পর ভূস্বামী শ্রেণী ও রাজকীয় আমলাতন্ত্রে প্রবেশ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত। এতে চীনা সামন্তব্যবস্থারই সংহতি বৃদ্ধি পেত।

Scanned with CamScanner